দৈনিক সংবাদ
তারিখ 07 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

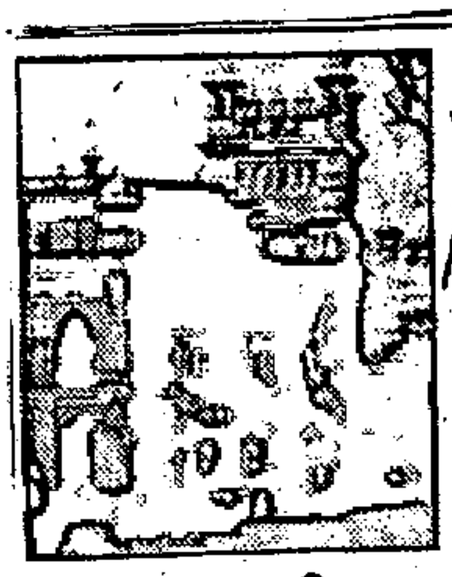

এ জি স্টক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ১৯৪৭–১৯৫১

রূপান্তর ঃ মোবাশ্বেরা খানম

ধারাবাহিক

এ্যান জেরাল্ডাইন স্টক জন্মেছিলেন ১৯০২ সালে ইংল্যান্ডে। লেখাপড়া শেষ করে লন্ডনের একটি কলেজে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করছিলেন আর বাকী সময় আত্মনিয়োগ করেছিলেন উপনিবেশ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনে। কেনিয়ার নেতা জোমো কেনিয়াত্তার ছিলেন তিনি একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক পদে তিনি যোগ দেন। শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধান এ.জি.স্টক ছাত্র হিসেবে এমন অনেককেই পেয়েছিলেন যারা ৫২'র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবন কেটেছিল পূর্ব পাঞ্জাব ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি আবার ফিরে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ১৯৪৭–৫১ এমন একটি বই যা আমাদের কেবল সেই সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, পরিস্থিতি—শিক্ষার মান, ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক, এইসব কিছুর সাথেই শুধু পরিচয় করিয়ে দেয় না সেই সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় একজন নিবেদিত শিক্ষকের স্নেহসিক্ত হৃদয়ের সঙ্গে যিনি এইসব কিছুই দেখেছেন এক নব্যস্বাধীন উপনিবেশের শৃঙ্খলমুক্ত জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রাণঢালা সমর্থন নিয়ে; কিন্তু সেই সঙ্গে মিশিয়েছেন একজন বিদেশীর কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা। মিস স্টক '৫২–র ভাষা আন্দোলনের পটভূমি দেখেছেন, দেখেছেন মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শহীদ মুনীর চৌধুরীকে দেখেছেন, দেখেছেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে। ডঃ সারোয়ার মুর্শেদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ছিলেন তার ছাত্র। এমন আরো অনেকেই যাঁরা আজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তার দেখা বাংলাদেশ তার দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, একজন বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে, নন্দিত শিক্ষক হিসেবে, আবার একজন তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবেও, যিনি এসবের ভেতরে থেকেও বিদেশী। তাই তাঁর দেখার ভেতরে আমরা আমাদের আবেগ, অভ্যেস, পরিবেশকে যেভাবে দেখতে পাই তা নূতন করে যেন আমাদের নিজেদেরকেই নিজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

এদেশের ছাত্র রাজনীতি, ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন তার মনে রেখাপাত করেছে। তার সহমর্মিত, সমবেদনা ও সেই সাথে তীক্ষ্ণ, সজাগ পর্যবেক্ষণ আমাদের মুখোমুখি করে কিছু বাস্তব সত্যের; যার প্রতি হয় নিজেদের আবেগের কারণেই আমরা অন্ধ। যেমন ১৯৭১ সালে ২০ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে তার মনে হয়েছে, তার ভূমিকা থেকেই উদ্ধৃত করছি ঃ

'বিশ বছর পর ফিরে এসে আমার মনে হলো, ছাত্ররা খুব বেশি বদলায়নি, যদিও আমি বর্তমানের চাইতে অতীতকেই বেশি জানি। মিছিল ও শ্লোগানে তাদের উৎসাহ দেখে মনে হয় তারা এখনো বিশ্বাস করে যে তারা যদি মিছিল না করে, শ্লোগান না দেয় সরকার জানতেই পাবে না জনগণ কি চায়, কি ভাবে। তারা ঠিক করছে কিনা সেটা একজন নবাগতের বিচার্য নয়, কিন্তু আশা করা যায় যে, সবসময়েই ঠিক এমন অবস্থা থাকবে না। নিশ্চয়ই জনগণ নিজেদের প্রকাশ করার সঠিক মধ্যমটি খুঁজে পাবে, সরকারও এখন আর বিদেশী নয়, সুতরাং সেও নিশ্চয়ই জনগণের আশা–আকাংখার প্রতি বধির হয়ে থাকবে না,আর ছাত্ররাও নিশ্চয়ই বুঝবে যে মিছিল–শ্লোগানকে আব্রেকটু কমিয়ে আনা মানে এই নয় যে তারা তাদের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। স্বীকার করছি এগুলো নিতান্তই সেকেলে এবং সংশোধনের অযোগ্য একজন শিক্ষকের মতামত। সারাজীবনের শিক্ষকতা আমার মনটিকেই এমনি করে তুলেছে। আমার মনে হয় প্লেটো তার রিপাবলিকে একটি অত্যন্ত সঠিক কথা বলেছেন যে, যার যার নিজের কাজটিই সুষ্ঠুভাবে করা একটি সত্য ও ন্যায়বোধে উদ্বুদ্ধ সমাজের মূল গাঁথুনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সঠিক জ্ঞানার্জন ও সরল চিন্তার বিকাশ। যদি এই মূলবোধ থেকে সে নিজকে যে কোন চাপের মুখেই হোক না কেন দুরে সরিয়ে নেয়। এই প্রবল চাপে ঘিরে থাকা পৃথিবীতে বিশ্বের আর কোন প্রতিষ্ঠানই তাহলে এই মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেবে না।"

আজকের সন্ত্রাসমুখর শিক্ষাঙ্গনে ও বিশ্ববিদ্যালয় কলুষিত রাজনীতি ও বিকৃত ইতিহাসে বিভ্রান্ত তরুণ প্রজন্মকে আমাদের অতীত ঐতিহ্যের সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়াটা খুব জরুরি মনে হচ্ছে। তাই শেকড় খোঁজার পালা শুরু হয়েছে। এখন যখন আমাদের শিক্ষা, মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক, ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক সবকিছুই বিরাট একটা প্রশ্নের মুখোমুখি, এখন এই বইটি হয়ত আমাদের ফিরিয়ে নিতে পারে সেই গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুখরিত ছিল জ্ঞান চর্চায় উন্মুখ ছাত্র ও শিক্ষকের পদচারণায়; উদ্বেলিত ছিল শত শত তরুণের দেশ ও ভাষার প্রতি ভালোবাসায়। বিস্মৃত প্রায় সেই অতীত খুঁড়ে নষ্টালজিক হবার জন্যেই এই বইটির প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু আংশ এই পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার আশারাখি।

কি ভাবে এলাম

সেটা ছিল নিশ্চয়ই ১৯৪৭–এর গোড়ার দিকে যখন Times Educational supplyment উগান্ডার ম্যাকারেরে কলেজের ইংরেজির একটি প্রভাষক পদে ও পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির একটি অধ্যাপক পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল। আমি দুটো পদেই আবেদন করেছিলাম যেন আমি নিজেই নিজের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে চাচ্ছিলাম যে এখন যাবার সময় হয়ে এসেছে।

এমন নয় যে, ইংল্যান্ড আমার রুচির সাথে খাপ খাচ্ছিল না। আমার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ আর দু'দিকেই সন্তোষজনক একটি দ্বৈত জীবন আমি যাপন করছিলাম। লন্ডনের একটি প্রশিক্ষণ কলেজে খন্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে আমি আমার প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করছিলাম। আর কাজ আমার ভাল লাগছিল– ভাল লাগছিল আমার সহকর্মী ও ছাত্রদেরকে, ভাল লাগছিল শিক্ষকতা। এমনকি খানিকটা বিরক্তি ও বদমেজাজের সাথে সেইসব ক্রোধজনক হতাশাগুলোতেও ভাল লাগছিল যা কিনা ঘিরে থাকে শিক্ষা বা Education এর বড় E কে। কারণ সৎ সংসর্গে ক্রোধান্বিত হওয়াও অনুপ্রেরণাদায়ক। "খন্ডকালীন" মানে আমার বৃহস্পতিবার ছুটি ছিল। আর বৃহস্পতিবারে ও সপ্তাহান্তের দিনগুলোতে এবং ছুটির সময়ে আমার কাজের চাপ ছিল খুব বেশি, মুক্তি আন্দোলনে জড়িয়ে ছিলাম বলে। এখানে ' ভাললাগা' শব্দটা ভুল। আমি এমন একটা বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম যে আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমার মনে হয়না যে আমি কখনো নিজেকে খুব শিগগিরই সাম্রাজ্যবাদের অবসানে সেই প্রত্যাশিত স্বর্ণযুগ আসবে বলে বিভ্রান্ত করেছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, এর শেষ হতেই হবে এবং আমার মেজাজ, মানসিকতা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও যা কিছু সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সবই একাভিমুখী হয়ে আমায় চালিত করছিল আমার এই বিশেষ নির্দিষ্ট গন্তব্যে। ভারত তখন স্বাধীন হবার পথেই প্রায়; ইংল্যান্ডে আমরা যা–ই ভাবি আর করিনা কেন, এই ব্যাপারে। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলোর স্বাধীনতা তখনো দুরআস্ত। আর আমরা এমন তীব্র ও দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছিলাম যে, অসম্ভাব্যতা বা তেমন সম্ভাবনা আমাদের বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে পারেনি। নিশ্চিতই এই কাজেই তার পুরস্কার এসেছিল। যৌথ কাজে সহযোগী হবার আনন্দ ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বন্ধুত্ব ছিল কাজ করার মস্ত সুবিধা। বিভিন্ন অপরিচিত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার ভেতরেও একই মূল্যবোধের স্বীকৃতি যেন ঝলসে উঠেছিল আমাদের মাঝে। আর পূর্ণকালীন শিক্ষকতার পদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বা পেনসনের আবিষ্কারের তা ছিল বিরাট ক্ষতিপূরণ।

এই দ্বৈত জীবনে অন্য কোন অসুবিধে ছিলনা, কেবল সমস্যা ছিল যে দুটো দিক যেন পরস্পরের সাথে খাপ খেতোনা, কারণ দুটোই ছিল জীবনগ্রাসী। সাহিত্যে আমার বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল। কেবল মাত্র গভীর বিশ্বাস ছাড়া, স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান রাখার মত কোন বিশেষজ্ঞের জ্ঞান আমার ছিল না। দুটো জীবনকেই আমার প্রয়োজনীয় মনে হলেও শেষ পর্যন্ত একটিকে বেছে নিতে হয়েছে। তাই এই নবোত্থিত দেশগুলোর কনোটিকে নিয়ে সাহিত্য পড়ানো আমার এই দ্বন্দ্বের সমাধান বলে মনে হলো। জাতি গঠনের কাজে হয়ত এই কাজ সামান্যই ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু তা একেবারে তুচ্ছও নয়। আর এই কাজের অনুশীলন আমাকে বুঝতে সাহায্য করবে সেইসব লোকদের ফাঁদের বন্ধ বোতলের ছিপি খুলতে সাহায্য করতে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। ক'মাস ধরে এই সক্রিয়যুক্তি আমার মাথায় কাজ করছিল, ১৯৪৬–৪৭ সালের প্রচন্ড শীতে দুটো বিজ্ঞাপন নিঃসন্দেহে সেই যুক্তিকে আরো জোরালো করে তুলল। সেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে কালো আকা, তীব্র ঠান্ডা বাতাস, বরফের স্তূপ শ্বাসরোধ হয়ে যাওয়া পথ আর জ্বালানির স্বল্পতা এই দুর্দশাকে বাড়িয়ে তুলে, রৌদ্র লোকে পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট ভালো যুক্তি দাঁড় করানো।

যোগ্যতার দিক থেকে আমি ভেবেছিলাম ম্যাকারেরে প্রভাষক পদটি পাওয়ার হয়ত সুযোগ আছে, কিন্তু স্পষ্টতঃই বাছাই কমিটি তা ভাবেননি। তাই আমাকে ইন্টারভিউতেই ডাকলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে আবেদনটি অবশ্যই একটি সাহসী পদক্ষেপ ছিল।